কী সন্ধানে যাই

মৌসুমী ভৌমিক

সমস্ত টানের সুত্র খুঁজতে চাওয়ার অর্থ হয় না। হয়তো প্রথমে যাওয়াটা থাকে। কিসের সন্ধানে যাই তা ধীরে ধীরে প্রতিভাত হয়, আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরূপও পালটে পালটে যায়। আজ মনে হয় এই জন্য যাই, কাল আর কিছু মনে হয়।

২০০৪ সালের ৬ই অক্টোবর কলকাতা শহরে সারারাত বৃষ্টি পড়েছিল। সাত ভোরে সুকান্ত যখন আমাকে স্টেশনে যাবার জন্য নিতে আসে, তখন প্রায় দেড় ফুট জল ডি-য়ে আমি ট্যাক্সিতে উঠি। আমরা রামপুরহাট যাবো, সেখান থেকে তারাপীঠ, কানাইয়ের কাছে। মাস কয়েক আগে আমি একলা একবার গিয়েছিলাম। কানাইদা সেদিন ছিলেন না, কলকাতায় এসেছিলেন গলার চিকিৎসা করাতে। মন্দির চত্বরে ফুল আর ধূপের দোকানের লোকেরা বলেছিল কানাই আর গান গাইতে পারছে না।

তারপর ওইদিন সারা শহরে দেখি জল, স্টেশনে মানুষজন কম। আর ট্রেনেও ইচ্ছে মতন জানালার কাছে সীট পাওয়া যাচ্ছে। ট্রেন যতই বোলপুর পেঋয়ে এগোয় ততই ভিজে চুপচুপে চারিপাশ। আমি আর সুকান্ত পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। তারপর সাঁইথিয়ায় ময়ূরাক্ষী পেরোনোর পর বৃষ্টির সত্যিকারের মাত্রাটা ধরা পড়ে আমাদের চোখে। যাবো কি আর? ভাবি কথাটা, তবু যাই। রামপুরহাটে অটোওয়ালারা বলে সবটা পথ গাড়ি যাচ্ছে না, খানিক পরে ট্রলিতে উঠতে হবে। কি জানি আমরা ওদের সব কথা বুঝতে পারি কি না? কারণ তাহলে আমরা আর এগোতাম না। অটো যেখানে নামিয়ে দেয় তার সামনে পাকা রাস্তা আর দু'পাশের মাঠঘাট সব নদী হয়ে গেছে। তাতে খরস্রোত জল বইছে। তারপরেও আমি গবেষক আর সুকান্ত সাউন্ড রেকর্ডিস্ট ভ্যানরিক্সায় চেপে বসি। ভ্যান ভেলা টলমল করে। আমি বাবু হয়ে বসে টের পাই পাটাতনটা জলের তলায় চলে যাচ্ছে,আবার ভসে উঠছে। রেকর্ডিং যন্ত্রের ব্যাগটা আমি উঁচু করে ধরে থাকি আর আস্তে আস্তে বলি,সুকান্ত আমি সাঁতার জানিনা। বলে হেসে ফেলি। সুকান্তও হাসে। আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে IFA (মানে,যারা আমাকে এই বাংলা লোকগানে বিরহ নিয়ে কাজ করার জন্য গ্রান্ট দিয়েছে) নিশ্চয় এমন নিষ্ঠার সঙ্গে কিন্তু ওয়ার্ক করার জন্য আমাদের একটা সোনার মেডেল দেবে।

দু'পাশে, সামনে পিছনে আরও ভ্যানরিক্সা,জল টেনে, সেগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর কাজ। আমাদের ঠিক সামনেই নীল প্লাস্টিকে ঢাকা একটা ভ্যান, তার এক কোণে একজন বসে, কানে আসে 'বল হরি,হরি বোল' ধ্বনি। আমি ভাবি,এমনই বুঝি এখানকার রীতি। বিপর্যয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমন করেই রঙ্গ করে মানুষ। সবাই মড়া কাঁধে চলার মতন। তারপর হঠাৎ টের পাই রঙ্গ নয়। নীল প্লাস্টিকের তলায় একটি লাশ আছে এবং আমরা সবাই এখন শ্মশানযাত্রীতে পরিণত। জলের স্রোতে খই ছড়াচ্ছে কেউ।

তারপর কানাইদার সঙ্গে দেখা হয়। শ্মশান মন্দিরের বেশিটাই জলের তলায় ডুবে গেছে। আমরা সিঁড়ির উপর বসে কথা বলি। কানাইদা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, আমি দু'একটা প্রশ্ন করি। কানাইদা উওর দেন, সুকান্ত রেকর্ড করে।

‘আমি পুকুরের জলে গলা ডুবিয়ে গান গাইতাম আর আমায় লোকে বলত তুই গানটাই গা।’
‘কী গান?’
‘ওই, যা শুনতাম চারপাশে। ছায়াছবি,হরিনাম। আমার একটা দাদা ছিল। পিসতুতো দাদা, সে একটা গান দিয়েছিল আমাকে : গৌরলীলার বাজারে অবাক যায় হেরে। বলেছিল, তুই এই গানটা শিখে নে। তোর বাবা-মা মারা গেলে তোকে দেখবে কে? তুই অন্ধ মানুষ। সেই থেকে গান শেখা আমার। মনে হতো, কতই তো অন্ধ খোঁড়া লোক আছে চারপাশে তাদের দেখে কে? আমাকে তো কিছু একটা করে বড় হতে হবে।’
‘আর বাউল হওয়া? কেমন করে হয় বাউল?’
‘কী জানি? বাউল কি আর অত সহজে হওয়া যায়। আমি কিছু সাধুর সঙ্গ করেছি মাত্র। গান গাইতে পারতাম,তখন প্রায় টেপ রেকর্ডারের মতো ছিলাম। যা শুনতাম, তাই গেয়ে ফেলতাম। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। বাউল কে হয় কে জানে? বাউল কি আর চোখে দেখা যায়?’

সেদিন ঔই কথাটুকু হয়েছিল, গানের জন্য আর থাকিনি আমরা। আমার ভয় করছিল, মনে হচ্ছিল জল এখন শুধু বাড়তেই থাকবে। একদিন দু’দিন ধরে। মড়া পোড়ানো যাবে না। আর তখন মড়াগুলোর কী হবে? আর আমি বাড়ি ফিরতে পারবনা। এত জল চারিদিকে, কীভাবে যে ফিরবো? সুকান্ত একটা গাড়ির খোঁজ করতে গেল, আমি পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখি ওদিক থেকে একজন আসছে, কুঁজো মতন, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। কাছে আসতে দেখি কপালে মস্ত একটা সিঁদুরের টিপ। হাসি হাসি মুখে সে বলতে বলতে চলেছে। ভাসছে। ভাসছে। বলতে বলতে পার হয়ে গেল।

পরের সপ্তাহে আমরা আবার গিয়েছিলাম কানাইদার কাছে। তখন জল নেমে গেছে। ওঁর বাড়ির বারান্দায় বসে সকালবেলায় গান হয়েছিল - রামপ্রসাদী, বিজয় সরকার, কীর্তন,লালন, মুর্শিদি গান। কানাইদার বৌ পাশেই উনুনে রান্না চড়িয়েছেন। আমরা উঠবো বলাতে বললেন, সে কি, অন্ন গ্রহণ না করেই যাবে? আমরা বললাম, আর একদিন খাবো। বললাম, আপনি আর একটা গান শোনান। তারপর আমরা যাই। কানাইদা গাইলেন : ‘কৃষ--কথা শুনতে লাগে ভাল। বল সই আবার বল।’ মনে হল বিজয় সরকারের এই গানটা দিয়ে যেন যথাযথ সমাপ্তি হলসেদিনের আসরের। কানাইদার ‘কৃষ--কথা’ দিয়ে।

এই যে মনে হওয়া, যা শুনি, দেখি। তা দেখে এর একটা কথা মনে হয়। সেই মনে হওয়া দিয়েই পরে আমরা আমাদের গল্পগুলোকে সাজিয়ে তুলি। রঞ্জন পালিতের ‘অবাক যাই হেরে’ ছবিতে কানাইদা বলেছিলেন : ‘এই শ্মশানের ঘ্রাণ। এছাড়া থাকতে পারি না। এর মধ্যে একটা আলাদা জীবন আছে।’ ‘ঘ্রাণ’ - ছবির শেষে শব্দটা বাজতে থাকে আমার কানে। তার কোনো বিশেষ অর্থ করি আমি।

দীপক মজুমদারের ‘ছুটি’ পড়তে পড়তে আমার রঞ্জনের ছবির কথা মনে পড়েছিল। ‘অনর্গল জোনাকির মতো ভাসতে থাকা নানা আন্তরিক পর্দায় মা, মা-গো, জয় ততারা ধ্বনি। মাতৃজঠরের আলো-আঁধারি জুড়ে কিছু মানুষ-শিশু। পুরুষ ও নারী- ঈষৎ আলোর আভা থাকলে যাদের ছায়ার মতো অপ্রতিভ দেখায় আর উদ্ভট অন্ধকারে যারা বিধাতার উজ্জ্বলতা পায়- তা সে মাতাল,চ্যাংড়া, ধনী, দুঃখী, পাগল, ব্যবসাদার, উদভ্রান্ত, বেশ্যা,স্তিতধী, অবধূত, পুলিশ, কবি, ভিখারিণী, গৃহস্থ, ওয়াগন-ব্রেকার, ভক্ত বা শয়তান, যেই হোক না কেন। গাছের তলায় ফোকরে ফোকরে ধুনি জ্বালিয়ে বসে তন্ত্রসাধক, কারো চারপাশে নিত্যসঙ্গী নরকরোটির সারি,কেউ বা যন্ত্র ও মন্ত্রে আসীন। মহাশ্মশানের আঁকাবাঁকা পথের দু’পাশে পাখির বাসার মতো জমাট এই সব আখড়া। ভোগ পরিবেশত হল। তরুণ তন্ত্রাভিলাসী অন্ন ভাগ করে খাচ্ছে দু’তিনটে ভক্ত কুকুর সঙ্গে একই পাতায়। আলুথালু বেশ জাগ্রতচিত্ত এক নারীকে মাঝে মাঝেই এমনভাবে ডুকরে

কেঁদে উঠতে দেখা গেল...।'

আমি দেখেছিলাম, বাংলাদেশের ফরিদপুর শহর থেকে দূরে। ম্যাম্বার গেট্টি নামের একটি গ্রামে এক রাতের এক মিলাদ অনুষ্ঠানে আর এক অন্ধ, ইব্রাহিম,কান্ডারী হয়ে মিলাদ পরিচালনা করছিলেন যেন জড়ো হওয়া ভক্তদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন এই বলে যে,চলো, এই তিমিরের ভিতর দিয়ে আমরা নৌকা বয়ে নয়ে যাই। বলো,আল্লা, আল্লা, আল্লা আল্লা। তালে তালে বৈঠা পড়ছিল জলের উপরে। আর সেই রাতে সে মাটিতে মাথা ঠোকাচ্ছিল,আবার উঠে বসছিল। জিকিরের তালে তালে। আল্লা, আল্লা,আল্লা, আল্লা ...

এক একটা মুহূর্তের উপর এমন সব অর্থ আমরাই আরোপ করি। যা শুনি,দেখি, তা নিজের মতন করে বুঝি, বোঝাই। এই আমাদের গল্প বলা। আর এমন সব মুহূর্তের জন্ম হবে বলেই আমাদের আসরে,মিলাদে, মেলায়, মেহফিলে আসা। সেই মেলা শিল্পী আর শ্রোতার মেলা, উভয়ের সংযোগে তার সৃষ্টি। গৌরক্ষ্যাপা গৌর বলেই অমন করে গান করেন। আর দীপক, দীপকের চোখ আর মন দিয়ে দেখেন 'বীরভূমের নাগার্জুন-প্রতিম' গৌরক্ষ্যাপাকে যে 'তারাপীঠের মহাশ্মশানের তীব্র অনুরাগে, নির্দিষ্ট কুম্ভীপাকের মোচড়ে, ঝাঁকড়া-সজাগ মাথাভর্তি চুল চামরের ছন্দে, মেরুদন্ডের হাত দুলিয়ে, খমকের সটান তীক্ষ্নতায়, দু'পায়ের আকস্মিক বজ্রযানী লাসে, মর্মপ্লাবী দু'চোখের ভাসমানতায়, ঠোঁটের অনাথ-চড়ুই উদ্বেগে .... ঘটিয়ে তুলছিল এমন এক আত্মনিবেদনের জগৎ, এমন এক বিস্ফোরণের ছবি, যার কোনো সংজ্ঞা হয় না, কোন তুলনার আলিঙ্গনে যাকে বাঁধা যায় না, চল্লিশ মিনিটের যে ব্রতচারণ মানুষকে ডেকে নেয় এক ভ্রূণাকুল সৌন্দর্য সাঁতারে।'

এতখানি সবাই দেখতে পায় না অবশ্যই। যেমন দীপকের দেখা। কিন্তু টানটা অনুভব করে তার নিজের মতন করে। ১৯৩২ সালে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ আর্নল্ড আদ্রিয়ান বাকে কেন্দুলিতে অচিন্ত্যদাসী নামের এক শিল্পীর গান রেকর্ড করেছিলেন মোমের সিলিন্ডারে। সেই রেকর্ডিং সম্পর্কে যে নোটটি পাওয়া যায় তা সংক্ষিপ্ত। কিন্তু বাকে যখন নাকি বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন, তখন কথার সঙ্গে গান গাইতেন। কারণ বাকে নিজে একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন। অতএব অচিন্ত্যদাসীর সুর হয়তো বাকের কণ্ঠেও কোথাও স্থান করে নিয়েছিল।

লন্ডনে বড় হয়ে উঠেছে রঙ্গন মোমেন। বাবা মা'র বাড়ি এই পশ্চিমবাংলায়। পার্টিশান, চাকরী ইত্যাদির সুত্র ধরে বাংলা হয়ে ওরা গিয়ে পৌঁছয় লন্ডনে। রঙ্গন কৈশোর শেষে দেশ দেখতে আসে আর কোনো এক অমোঘ টানে বাঁধা পড়ে যায় এই বাউল ফকির জীবনের সঙ্গে। রঙ্গন নিজেকে Compulsive Collector বলে, যেন গান সংগ্রহ না করলে ওর চলে না। এক সময় কালো মানুষদের গান reggae সংগ্রহ করতো। তারপর বাউল-ফকিরি গান। আমি অনেক গান, অনেক নাম শুনেছি, শিখেছি রঙ্গনের কাছে। বীরভূমের, কুষ্ঠিয়ার অনেক শিল্পীর বাড়িতে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছি রঙ্গনের বন্ধু বলে। রঙ্গন বলে এই গান সংগ্রহ ওর 'সাধনা' যেমন সংগ্রাহক দেবেন ভট্টাচার্য্যের ছিল। রঙ্গন গুরু বলে মানত ভাস্করদাকেও। ওই দূরদেশে থেকে মনটাকে লালন করতে শিখেছে যে রঙ্গন তা এমন মানুষদের ছায়া পেয়েছে বলেই।

আর এক রকম সাধনা দেখি জান ওপেনক্ষর মধ্যে। গত তিরিশ বছর ধরে ফিরে ফিরে আসছেন বীরভূমে,বাউল সাধনার জগৎটাকে বুঝবেন বলে। জান তার নিজের মতন করে একটা জগৎকে নির্মাণ করছেন, তার দেখা-শোনা-বোঝা দিয়ে। সংসারের টান আর মুক্তি-চাওয়া-মন তাঁকে ভাবায়, সংসারের

ভিতরে থেকেই মুক্তির সাধনা সম্ভব কি না জান তার অনুসন্ধান করেন। তেমনই আমি বুঝেছিলাম জানের সঙ্গে কথা বলার সময়। আমায় যত না ওর Seeking Bauls in Bengal বইটি টেনেছে, তার চেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছেন জান নিজে,নাড়া দিয়েছে ওর এই বার বার ফিরে আসা।

একবার একটা ইন্টারভিউ-এ গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি কখনও কোন বড় রেকর্ড লেবেল-এর কাছে যাবেন না। কারণ মহিনের ঘোড়াগুলি was all about subversion। সাবভার্সান শব্দটার কোন জুতসই বাংলা খুঁজে পাই না। তবে মনে হয় যে এই সাবভার্সানের অর্থ এক ধরনের মুক্তমন নিয়ে চলাও বটে। হয়তো সেই জায়গা থেকেই গৌতম বাউল ফকিরি গানের প্রতি এক বিশেষ টান অনুভব করতেন। এই গানের সঙ্গ করার ফলেই হয়তো তার কিছু কিছু চিহ্ন রয়ে গিয়েছিল মোহিনের ঘোড়াগুলির গায়ে।

সংযোগের, মিলনের চিহ্নগুলি আসলে দুই তরফের জীবনেই লেখা হয়ে যায়। যেমন গৌতমের কণ্ঠে এক মুহূর্তের জন্য হয়তো গৌর অবস্থান করতে পারতেন, তেমনি মেলা থেকে শহরের পথ, আকাশচেরা জেটরেখা থেকে পোল্যান্ড উডস্টকের অলিগলি এক অন্য মানচিত্রের কনট্যুর লাইন দেখা দিতে পারে বীরভূম-নদীয়া-যশোহর-ফরিদপুরের বাউল ফকিরের গায়ে। ষাটের দশকে অ্যালেন গিন্সবার্গ কলকাতা ঘুরে গিয়ে উডস্টকের অ্যালবার্ট গ্রসমান ও ম্যালি গ্রসমানকে গিয়ে বলেন পূর্ণদাসের কথা। গ্রসমানরা আসেন কলকাতায় এবং তার পরিণাম ১৯৭৬ সালে উডস্টকে বিগ পিংক নামের একটি স্টুডিও বাড়িতে পূর্ণদাস, সধানন্দ দাস ও লক্ষণ দাসের রেকর্ডিং । Bauls of Bengal at the Big Pink অ্যালবামটি যত্ন করে রেকর্ড করেছিলেন The Band নামক Rock 'n' Roll ব্যান্ডের গার্থ হাডসন। The Band-এর ড্রামার লেভন হেলম ওঁর The Wheel's on Fire বই-এ লেখেন :

'... We invited 'em to the Big Pink one night. The Bauls had long black hair braided to the waist and were wearing cowboy hats they'd picked up on the drive east from California, where they'd arrived direct from Bengal.

(Before heading east in a beat-up old van, they'd played the Fillmore West on a bill with the Byrds.) They loved the bubbling beer sign over our fireplace, and I played checkers with some of 'em, and we were laughing very hard. I was smoking a chillum with Luxman Das, and I said, “Man, that's some good weed."

He smiled and said,” Very good, but nothing like my father used to smoke - little hashish, little tobacco, little head of snake."

I said,"Wait a minute. Did you say 'snake head'?"

And Luxman laughed. “Yes, by golly! Chop off head of snake, chop into tiny pieces, put in chillum with little hash, little tobacco.Oh, boy! Very good - first class high!"

"Snake?" I pressed him.” Are you sure you mean snake?"

Now they were all laughing.” Yes! Very good! Head of snake!"...

Everybody around Woodstock in those days loved the Bauls. They were close to the bone of what music should be all about: ecstatic, unrelenting. They told us they loved Woodstock too because there was all this forest and no tigers to eat the children and goats. Their presence can be felt if you look at the photo of two of them - the brothers Luxman and Purna Das - posing with Bob Dylan on the cover of his new album, which came out the following month -"John Wesley Harding".'

এইভাবে এক একটা গানের জগৎ নির্মাণ হয়ে যায় এক এক ধরনের শ্রোতার সামনে। নির্মাণ আমরা সবাই করি। ইমেজ তৈরি করি, নিজের এবং অপরের। রুচির যোশীর 'এগারো মাইল'-এ পবন 'তুই আমারে পাগল করলি রে' গায় রাজপথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে; মাল-বোঝাই ঠেলাগাড়ি, সিনেমার হোর্ডিং, এমনকি একটা গরুর গাড়িও গড়িয়ে গড়িয়ে চলে কলকাতার বুকের উপর দিয়ে। বব ডিলান তাঁর John Wesley Harding অ্যালবামের প্রচ্ছদের জন্য পূর্ণদাস, লক্ষ্মণদাস এবং গ্রসমানদের বাগানের কর্মরত এক কাঠের মিস্তিরিকে সঙ্গে নিয়ে তোলেন, কারণ তিনি ওই 'real people'-এর ইমেজটাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এতে ডিলানের এক ধরণের ইমেজ তৈরি হয়। পূর্ণদাসের আর এক ধরণের।

দীপক মজুমদারের মনে হয়েছিল এই যাওয়া-আসার ফলে কোথায় যেন গৌর-পবনের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যারা নিয়ে যায় তাদের আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল, দীপক রুচিরকে বলেছিলেন 'এগারো মাইল'-এ। কারণ দুই পৃথিবীর ছন্দ এক নয়, বলন-চলন এত ভিন্ন। তারপর ওরা ফিরে এসে আর ফিরতে পারে না। হরি খুব কষ্ট পেত গৌর চলে গেলে, দীপক বলেছিলেন।

কিন্তু, কেমনতর দায়িত্ব পালনের কথা বলেছিলেন দীপক? যে, খেয়াল রাখতে হবে, যাকে নিয়ে যাচ্ছি, সে যেন তার পুরোন জীবনে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু তা কি সম্ভব? একবার যাবার পর সেই একই জায়গায় ফেরা যায় কি আর? জর্জ লুনোর ছবিতে কার্তিক তখন ছোট ছেলে, তাকে জর্জ আর ভাস্কর একভাবে নির্মাণ করলেন। ছবির স্বার্থেই ওই নির্মাণ। কিন্তু 'এগারো মাইল'-এ কার্তিক বলেছে ওই ছবিই কিছুটা তাকে এই পরবর্তী বাউল জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। আজকের 'দেখে যা রে মাঝভান্ডারি'র কার্তিক তার নিজস্ব নির্মাণ।

এই ভাঙাগড়া চলতেই থাকে। তাকে ঠেকানো কেমন করে? আজ এই নবনগর-বিবেকানন্দ ময়দানে (শক্তিগড়ের) মেলা বসে। কাল হয়তো আর কোথাও সরে যাবে মেলা। অথবা আর হবেই না। আরো অনেকদিন পর হয়তো মাঠ ভরা উঁচু বাড়ির দিকে তাকিয়ে আমাদের মনে পড়বে এইখানে একদিন সকালবেলায়, কণ্ঠে আশ্চর্য মায়া মেখে, কানাই গেয়েছিলেন 'আমি তোমায় ভজে সব হারালাম, হলাম পথের ভিখারী/ আমার ধন কূলমান, জীবন, যৌবন, সব কিছু নিল হরি।'

****